পিলখানা হত্যাকান্ডঃ
বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের ভারতীয় ষড়যন্ত্র

১. সূচনা

বিডিআর সদর দপ্তরে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনা, বিশেষ করে পরিকল্পিতভাবে সেনা কর্মকর্তাদের নৃশংস হত্যাকান্ডে দেশবাসী মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ। আমরা এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত সকলের রূহের মাগফেরাত কামনা করি ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। নিরস্ত্র সেনা কর্মকর্তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা, স্ত্রী ও সন্তানদের নির্যাতন ও হত্যা, গর্ভবতী মাকে খুন, লাশ পোড়ানো ও গণকবর তৈরী ইত্যাদি পৈশাচিক কর্মকান্ড নিঃসন্দেহে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। গত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী পিলখানায় সংঘটিত হত্যাকান্ড নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়েছে। রহস্য উদঘাটনে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি। পরবর্তীতে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের কথা বলে সরকারের মন্ত্রীদের বাদ দিয়ে নতুন কমিটি করা হয়। এরপর আবার সরকারের এক মন্ত্রীকে গঠিত কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়, যার উদ্দেশ্য তদন্ত কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সত্যকে আড়াল করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের অবশ্য স্মরণ আছে অতীতে কোন তদন্ত কমিটির মাধ্যমে কখনোই প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হয়নি, হলেও দেশবাসী তা জানতে পারেনি। ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারীরা সবসময় আড়ালেই থেকে গেছে। তবুও আমরা দাবি করব জঘন্য এ হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং মূল পরিকল্পনাকারীদের মুখোশও উম্মোচন করতে হবে।

ইতিমধ্যে সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রকারীদের তালিকায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র', আইএসআই, বিএনপি-জামায়াত জোট, জেএমবি, ক্ষমতাসীন সরকারের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ইত্যাদি বহু নাম মিডিয়ায় এসেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, জাতির এই চরম দুর্দিনেও আমরা ক্ষমতাসীন সরকারকে অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত আচরণ করতে দেখছি। প্রধানমন্ত্রী এবং তার একনিষ্ঠ সমর্থকরা যেভাবে কোনরকম দলিল-প্রমাণ ছাড়াই আক্রমণাত্মক কথার মাধ্যমে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে দায়ী করছে তাতে মনে হচ্ছে, সরকার প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করতে অথবা যেনতেনভাবে দায় মুক্ত হতে চায়।

২. ঘটনার বিশ্লেষণ - সন্দেহের তালিকার শীর্ষে ভারত

২.১ ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পিলখানা ষড়যন্ত্রের মূল রহস্য উদঘাটন করতে হলে প্রথমে সমগ্র বিষয়টিকে ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে হবে। দেশের অস্তিত্ব বিরোধী এতো বড় একটি ষড়যন্ত্রের পেছনে বাইরের শক্তির সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব সম্প্রতি বিশ্ব রাজনীতির স্পটলাইট মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরিয়ে দক্ষিণ এশিয়াতে স্থাপন করেছে। এজন্য, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ভারতের কাছে বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত ও চীনের মাঝামাঝি অবস্থানের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্ব অনেক। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরের গভীরে সামরিক ঘাঁটি তৈরী করতে (যাকে তারা এখন বলছে বঙ্গোপসাগরে নৌ-টহল দেয়া) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি তাঁবেদার সরকার বসাতে চেষ্টা করছে, যে তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র ইদানীং পরস্পরের মিত্রশক্তিতে পরিণত হলেও দক্ষিণ এশিয়াকে ঘিরে ভারতের আছে নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা। বস্তুতঃ ভারত এই উপমহাদেশে নিজেকে চালকের আসনে দেখতে চায়, আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে নিজের অবস্থান সুসংহত করতে চায় এবং এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যেই নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান, মিয়ানমার কিংবা বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রগুলোকে ক্রমশঃ ভারতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়ার রয়েছে তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা।

আধিপত্যবাদী এই নীতি থেকেই ভারত সবসময় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে অস্থিতিশীল দেখতে চায়, পরিণত করতে চায় ব্যর্থ রাষ্ট্রে। যেন ভুটানের মতো বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও নেপালও রাষ্ট্র হিসাবে ব্যর্থতার গ্লানি কাঁধে নিয়ে একসময় ভারতের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যায়। এ লক্ষ্যে ভারত সবসময়ই প্রতিবেশী দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অশান্ত করতে চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নানারকম অপতৎপরতা বা অপপ্রচার। বিগত বেশ ক'বছর যাবত বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসাবে ব্যর্থ প্রমাণ করতেও চলছে একই রকম অপতৎপরতা। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দূর্বল করতে সেনাবাহিনীর ইমেজ নষ্ট করারও চেষ্টা চালানো হয়েছে বিভিন্নভাবে। এই প্রসঙ্গে গত ১৯ নভেম্বর ২০০৮ প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও পুত্র সজিব ওয়াজেদ জয় ও কার্ল জে সিওভাক্কো কর্তৃক লিখিত ও Harvard International Review নামক পত্রিকায় প্রকাশিত Stemming the Rise of Islamic Extremism in Bangladesh শীর্ষক নিবন্ধের সারমর্ম উল্লেখ করা যেতে পারে। ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ এর নির্বাচনের পূর্বে লিখিত এই নিবন্ধে জয় বলেছে "The Islamists cleverly began growing their numbers within the Army by training for the Army Entrance Exams at madrassas." অর্থাৎ সেনাবাহিনীতে চালাকি করে মাদ্রাসার ছাত্ররা ঢুকে পড়ছে; এটা হচ্ছে মাদ্রাসা পর্যায়ে সেনাবাহিনীর ভর্তি পরীক্ষার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। তিনি ঐ নিবন্ধে এ সম্পর্কে অসংখ্য তথ্য (তথাকথিত) উপস্থাপন করেছিলেন যার কোন সূত্র

উল্লেখ করা ছিল না। সেনাবাহিনীর ইসলামীকরণ ঠেকানোর জন্য তিনি Toward Renewal: A Secular Plan শিরোনামে অনেক কিছুর মাঝে সেনাবাহিনী পূনর্গঠনের পরিকল্পনাও উপস্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও ভারতের এ দেশীয় দালালরা বিভিন্ন টকশো বা সভা-সেমিনারে এ দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদগার করেছে এবং জনগণ ও সেনাবাহিনীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

শক্তিশালী নেতৃত্ব, শাসনব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ যদি একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তবে তা হবে ভারতের আধিপত্যবাদী নীতির জন্য হুমকি স্বরূপ। কারণ, তাহলে অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর জন্য তা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবং তারাও ভারতের প্রভাববলয় থেকে বের হয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। পরিণতিতে ভারতের 'অখন্ড ভারত' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পরক্ষণেই কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপানলি বলেছিলেন : Neither the Congress nor the nation has given up its claim of United India' - কংগ্রেস কিংবা জাতি অখন্ড ভারতের দাবি পরিত্যাগ করেনি। ভারতের তৎকালীন প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেছিলেন : 'Sooner than later, we shall again be united in common allegiance to our nation.' অর্থাৎ অতি সত্বর আমরা জাতি হিসেবে আবার একীভূত হব। ল্যাবি কলিন্স ও ডমিনিক লেপিয়ার লেখা বই মাউন্ট ব্যাটেন অ্যান্ড দ্য পার্টিশন অব ইন্ডিয়া-য় বলা হয়েছে, স্বাধীন বাংলার তখনকার দাবির বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভার আপত্তি সমর্থন করেছিলেন পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু। এ প্রসঙ্গে মাউন্ট ব্যাটেন উল্লেখ করেন: Pundit Neheru has stated that he would not agree to Bengal being independent... In his opinion, East Bengal was likely to be a great embarrassment to Pakistan. Presumably, Pundit Neheru considered East Bengal was bound sooner or later to rejoin India.' অর্থাৎ পন্ডিত নেহেরু বলেছেন যে তিনি স্বাধীন বাংলা মেনে নেবেন না। ... তার মতে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। পন্ডিত নেহেরু মনে করতেন যে পূর্ব বাংলা এক সময় ভারতের সাথে যোগ দিবে। এখানে ইন্ডিয়া ডকট্রিনের প্রতিফলন রয়েছে। ইন্ডিয়া ডকট্রিনের সারকথা হচ্ছে - দক্ষিণ এশিয়া হচ্ছে একটা স্ট্র্যাটেজিক ইউনিট, যার নিয়ন্ত্রণ থাকবে ভারতের হাতে; আর ভারতই এ অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক নীতি প্রণয়নের অধিকার রাখে। আমরা শুনেছি গুজরাল ডকট্রিনের কথাও - ভারত তার স্বার্থের প্রতি আঘাত সৃষ্টিকারী যেকোনো দেশের ওপর আক্রমণ চালানোর অধিকারও রাখে।

২.২ বাংলাদেশের প্রতি ভারতের ঐতিহাসিক আচরণ

এ দেশের বামঘরানা ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতির মানুষেরা কোন এক রহস্যজনক কারণে ভারতের ব্যাপারে অত্যন্ত রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই গত ৩৮ বছর যাবত বাংলাদেশের প্রতি ভারতের তীব্র শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব ও চরম বিমাতাসুলভ আচরণের পরও তারা সকল ক্ষেত্রে ভারতকে ষড়যন্ত্রকারীদের তালিকার বাইরে রাখেন। প্রয়োজনে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে হলেও তারা ভারতমাতার স্তুতি গাওয়াকেই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করেন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও ভারত প্রেমিক বুদ্ধিজীবি ভারতমাতার পায়ে জীবন উৎসর্গ করতে চান। মেনে নিতে চান ভারতের সকল অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া। কিংবা, ভারতের আধিপত্যবাদী ও আগ্রাসনমূলক কার্যকলাপকে দেখেন মাতৃসুলভ স্নেহের দৃষ্টিতে। গত ৩৮ বছরে বাংলাদেশের সাথে ভারত যে বন্ধুপ্রতিম (?) আচরণ করেছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- প্রায় ৪ হাজার কি.মি. দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের ভূমিকা আগ্রাসনমূলক। বিএসএফ গড়ে প্রতি তিনদিনে একজন করে বাংলাদেশী হত্যা করছে বলে তথ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এদের বেশীর ভাগই নিরীহ গ্রামবাসী। এমনকি ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা প্রতিনিয়ত অবৈধভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিরীহ গ্রামবাসীদের সম্পদ লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি জঘন্য কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।
- আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ভারত সীমান্তে দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া তৈরী অব্যাহত রেখেছে।
- মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারতকে বেরুবাড়ি হস্তান্তর করলেও, বাংলাদেশ এখনো তিনবিঘা করিডোর ফেরত পায়নি। উপরন্তু, এ সব অঞ্চলের মানুষেরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও গত ৩৮ বছর যাবত উন্মুক্ত জেলখানায় বন্দী হিসাবে দিন কাটাচ্ছে।
- বাংলাদেশের সীমানায় জেগে উঠা তালপট্টি দ্বীপকে ভারত জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। নীলফামারী, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন পয়েন্টে এখনো এদেশের হাজার হাজার একর জমি ভারতের দখলে রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ভারত আমাদেরকে পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করেছে। তারা ফারাক্কা বাঁধ, টিপাইমুখী বাঁধসহ উজানে আরও ডজন খানেক বাঁধ দিয়ে এদেশকে পুরোপুরি মরুভূমি করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। ভারতের 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প' বাস্তবায়িত হলে তা বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও অর্থনীতিতে ডেকে আনবে চরম বিপর্যয়। কমে যাবে নদীর নাব্যতা, মিঠা পানির মাছের উৎপাদন হ্রাস পাবে, আর্সেনিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করবে এবং ক্রমশ: বাংলাদেশের বিশাল এলাকা পরিণত হবে ধূ ধূ মরুভূমিতে।

- চোরাকারবারীদের মাধ্যমে ভারত এদেশে মাদক, জালমুদ্রাসহ ভারতীয় বিভিন্ন নিম্নমানের সামগ্রী ঠেলে দিচ্ছে। আর, অপরদিকে এদেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে তেল ও সার। বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্টি থেকে জানা যায়, পিলখানা ট্রাজেডির পর সীমান্তে বিডিআরের অনুপস্থিতির সুযোগে এদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল, ভোজ্যতেল ও সার ভারত ও মিয়ানমারে পাচার হয়ে গেছে। আর দেশে প্রবেশ করেছে মাদকসহ বিভিন্ন নিম্নমানের ভারতীয় সামগ্রী।
- ভারত সবসময়ই এদেশীয় কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। নানাভাবে উস্কে দিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে। ২০০৭ সালের ১৭ আগষ্ট সিরিজ বোমা হামলার সাথেও ভারতের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং সেইসাথে জেএমবি নেতাদের বহুবার ভারত যাওয়া আসার প্রমাণ মিলেছে।
- খোদ ভারতের মাটিতেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় 'নিখিল বঙ্গ সংঙ্ঘের' ব্যানারে চলছে বাংলাদেশকে বিভক্ত করার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র। সম্প্রতি কলকাতার বঙ্গসেনারা এদেশের ১৯টি জেলা নিয়ে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক একটি প্রবাসী বঙ্গভূমি সরকার গঠনের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাদের শ্লোগান ছিল 'বঙ্গভূমির দখল চাই'। তারা ভারত সরকারের চোখের সামনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই হীন অপতৎপরতা চালাচ্ছে।
- বাংলাদেশের যুবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য ভারত দীর্ঘ এই সীমান্ত অঞ্চলে অসংখ্য ফেনসিডিলের কারখানা তৈরী করেছে এবং অবৈধ উপায়ে তা বাংলাদেশে পাচার করছে। ফলে মাদকের মরণনেশায় ধ্বংস হচ্ছে এ দেশের যুবসমাজ।

কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে এদেশের বিরুদ্ধে ভারতের এত ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতার পরও বিগত ৩৮ বছর ক্ষমতাসীন প্রতিটি সরকার ভারতকে বন্ধুর মর্যাদায় আসীন করে তার প্রতি নতজানু পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করেছে। শুধু তাই নয়, তারা বিভিন্ন সময় ভারতকে এদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপেরও সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে।

২.৩ সন্দেহের তালিকার শীর্ষে ভারত কেন?

বর্তমান সরকার ও তাদের ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবীরা যুক্তি দিচ্ছেন - ভারত বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করবে না, কারণ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়; যারা বর্তমান সরকারকে হটাতে চায় তারাই এসব করেছে; এসবের পিছনে জঙ্গিরাও থাকতে পারে - তাদের এসব কথার কোন ভিত্তি নেই:

- প্রথমত: বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করা ভারতের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অতীতেও ভারত এই প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতের 'অখন্ড ভারত' ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আঞ্চলিক শক্তির মর্যাদা লাভের পথ সুগম হয়।
- দ্বিতীয়ত: মুসলিমপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সবসময়ই ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। বিডিআর বিদ্রোহের মাধ্যমে সবেচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে আমাদের সেনাবাহিনী। এখানেও লাভবান একমাত্র ভারত। যেসব মেধাবী সেনা কর্মকর্তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের মত সেনা কর্মকর্তা তৈরী করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। উপরন্তু এই সেনা হত্যাকান্ডের মাধ্যমে বিডিআর ও সেনাবাহিনীর মধ্যে যে সন্দেহ এবং ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে, তার দীর্ঘ মেয়াদী সুবিধাও যাবে ভারতের পকেটে।
- তৃতীয়ত: দেশের সীমান্ত অরক্ষিত হলে সবচেয়ে সুবিধা হবে ভারতের। ভারত এ সুযোগে অনেক পুশ ইন করবে, যার মধ্যে রয়েছে ফেনসিডিল, ইয়াবা, ভারতীয় মটর সাইকেল এবং কিছু মানুষ, যারা কোন ঘটনা ঘটাবার অপেক্ষায় থাকবে। অন্যদিকে বিডিআরের চেইন অব কমান্ড ধ্বংসের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিডিআরকে তার পূর্বের শক্তিশালী অবস্থায় ফিরিয়ে আনতেও দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।

৩. ঘটনা-পরবর্তী ভারতীয় প্রতিক্রিয়া

বিডিআর হেডকোয়ার্টারে ঘটে যাওয়া নারকীয় হত্যাযজ্ঞের পরপরই ভারতীয় রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উক্তি থেকে শুরু করে, তাদের সামরিক বাহিনীর ব্যাপক প্রস্তুতি এবং সে দেশের ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রকাশিত খবরগুলো যে কোন ব্যক্তিকে উদ্বিগ্ন করার জন্য যথেষ্ট। নির্মম এ হত্যাযজ্ঞের সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এ বিষয়গুলো যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে।

৩.১ ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া

ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মনোভাব বলে দেয় যে তারা এই ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে:

- ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করে পরিস্থিতি মোকাবিলায় যে কোন ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন এবং বিডিআরকে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দেন।
- "...এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে সব ধরণের সহায়তা দিতে ভারত প্রস্তুত। ... আমি তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী পাঠাতে চাই, যারা বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারকে

দুর্বল করার চেষ্টা করছে, তারা যদি একাজ অব্যাহত রাখে, ভারত হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, প্রয়োজনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে"। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস নেতাদের বৈঠকে একথা বলেন, যা আউট লুক-এর একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়।

শেখ হাসিনার সরকারকে রক্ষা করার প্রয়োজন কেন ভারতের? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ২৫ ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর বিডিআর এর যে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে তা ভারত শেখ হাসিনার মাধ্যমে করাতে চায়। এমনকি সম্ভব হলে তারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সংস্কারও করতে চাইবে।

৩.২ ভারতের সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়া

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক প্রস্তুতি দেশবাসীকে উদ্বিগ্ন করেছে। এই প্রস্তুতি সম্পর্কে মিডিয়ায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- ভারতের প্রখ্যাত ইংরেজী দৈনিক Hindustan Times এ গত ২ মার্চ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিদ্রোহের পরপরই বাংলাদেশে humanitarian intervention বা মানবিক হস্তক্ষেপের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি প্রস্তুত রাখা হয়েছিলো। পত্রিকাটি জানায় যে, বিদ্রোহের দিন ভারতের বিমান বাহিনী (আইএএফ) IL-76 হেভি লিফ্ট এবং AN-32 মিডিয়াম লিফ্ট এয়ারক্রাফট নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে পূর্ণ সহায়তা দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলো। আসামের জোরহাটে অবস্থিত ভারতের সবচাইতে বড় বিমান ঘাটিকে এই সহায়তা মিশনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।
- বিএসএফ এর একজন ডাইরেক্টর জেনারেলের উক্তি থেকেও ভারতের সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। গত ৪ মার্চ এক বিবৃতিতে তিনি বলেন,"বাংলাদেশে এই সঙ্কট (শুরু) হবার পর, আমরা ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে কর্তব্যরত আমাদের সকল সৈন্যদল ও অফিসারদের সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়েছি।"
- বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে জানা যায় ঘটনার পরপরই সীমান্তে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বেনাপোলসহ বিভিন্ন স্থলবন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় ভারি অস্ত্রশস্ত্রসহ বিপুলসংখ্যক বিএসএফ সদস্যের পাশাপাশি বিশেষ কমান্ডো বাহিনী ব্ল্যাকক্যাট মোতায়েন করে। একই সাথে সমস্ত সীমান্ত জুড়ে রেডএলার্ট জারি করে।
- ভারতের প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে জানা যায় ভারত সরকার মৈত্রী এক্সপ্রেসের নিরাপত্তার জন্য বিএসএফ-কে শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসাবে বাংলাদেশে পাঠানোরও প্রস্তাব দিয়েছে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে, বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বিডিআর বাহিনীর অভ্যন্তরীণ এই বিদ্রোহকে ঘিরে ভারতের মতো একটি বিশাল রাষ্ট্রের এতো প্রস্তুতি কেন। আর যাই হোক এই বিদ্রোহ কোনভাবেই ভারতের জন্য নিরাপত্তা হুমকি ছিলো না। আর তাছাড়া যে বিদ্রোহের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা (প্রধানমন্ত্রীর সংসদে প্রদত্ত ভাষ্য অনুযায়ী) প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন, যে জন্য তারা সেনা অফিসারদের রক্ষায় দ্রুত সামরিক অভিযানে না গিয়ে ৩৬ ঘন্টা যাবত হত্যাকারীদের সাথে একের পর এক বৈঠক করে ধীর স্থিরতার সাথে রাজনৈতিকভাবে সামরিক বিদ্রোহ দমন করলেন, সেই বিদ্রোহের গুরুত্ব বা ভয়াবহতা ভারত সরকারই বা কিভাবে বুঝে ফেললো ? এছাড়া এ দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যকার যে কোন বিদ্রোহ দমনে এ দেশীয় দক্ষ সেনাবাহিনীই যথেষ্ট, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাহলে, ভারতের মিশন কী? বাংলাদেশের বর্তমান বন্ধু সরকারকে রক্ষা করা? বাংলাদেশের সরকারকে রক্ষা করবে ভারতীয় বাহিনী। কেন? আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী নেই? নাকি প্রধানমন্ত্রী তাদের বিশ্বাস করেন না?

৩.৩ ভারতের মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া

২৭ ফেব্রুয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত এদেশের জনগণও পুরোপুরিভাবে তথাকথিত এই বিদ্রোহের আসল রূপ বুঝতে পারেনি। অথচ পুরো সময়ে ভারতীয় মিডিয়া ছিল অত্যন্ত তৎপর:

- বিডিআর জেনারেল শাকিল আহমেদসহ আরও ১১ জন সেনা কর্মকর্তার নিহত হবার সংবাদ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা নিয়ন্ত্রিত চ্যানেল এনডিটিভিতেই সর্বপ্রথম প্রচার করা হয়েছে। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা যেখানে দুই দিনেও শাকিল আহমেদের মৃত্যু নিশ্চিত করতে পারেনি, সরকারের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ঘন ঘন বিডিআর হেডকোয়ার্টারে যাতায়াত করে হত্যাকারীদের সাথে দফায় দফায় দেনদরবার করেও যেখানে গণহত্যার খবর পায়নি, সেখানে সুদূর ভারতে বসে ভারতীয় মিডিয়া ১২ জন অফিসারের নিহত হবার বিষয়ে কি করে নিশ্চিত হলো? তাহলে কি তাদের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টরা বিডিআর হেডকোয়ার্টারের ভেতরে অবস্থান করছিলো?
- ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর সাবেক শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা বি. রমন ২৭ ফেব্রুয়ারী ভারতের বিখ্যাত ম্যাগাজিন আউটলুকে বলেন ভারতের প্রতি বিডিআর সদস্যদের বৈরী মনোভাব বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা।
- ঘটনার পরপরই ভারতের প্রিন্ট মিডিয়ায় বিডিআরকে একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাহিনী হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- আর আনন্দবাজার, টেলিগ্রাফ এর মত পত্রিকাগুলো বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে আক্রমণ করে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রচার করেছে। এমনকি বিডিআর-এর ঘটনায় জঙ্গী কানেকশন ভারতীয় মিডিয়াই প্রথম আবিষ্কার করে। পরবর্তীতে একই ধরণের কথা আমরা এদেশের মন্ত্রীদের মুখে শুনতে পাই।

৪. সরকারের ভূমিকা

৪.১ ফেব্রুয়ারী ২৫-২৬

পরিস্থিতির বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় ঘটনার শুরু থেকেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার রহস্যজনক ভূমিকা পালন করেছে। এতো বড় ঘটনার পরিকল্পনা চলছিল আর সরকার তা জানে না, একথা মেনে নেয়া যায় না। তাছাড়া জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট অতি গুরুত্বপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে কেন শুরুতেই অনভিজ্ঞ প্রতিনিধিদের পাঠানো হয়েছে যারা কতিপয় বিদ্রোহীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে? অথচ তারা সেনা সদস্য ও তাদের পরিবারের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেনি। সেনাসদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করেই সরকার কি উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলো? যে ঘোষণার সুযোগ নিয়ে তারা দেড় দিন ধরে লাশ গুম, ব্যাপক লুটতরাজ ও সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারবর্গের উপর নির্যাতন করেছে। ২৬ ফেব্রুয়ারী বিকালে বিডিআর সদর দপ্তরের আশেপাশের লোকজনকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে এবং বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে প্রকৃতপক্ষে কি ঘাতকদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়নি? সাহারা খাতুন ২৫ ফেব্রুয়ারী অস্ত্র জমা নিলেন, তারপরও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র বাইরে গেল কিভাবে? যেসব বিদেশী নাগরিক আইডিসহ ধরা পড়েছিল, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল কেন? বিমানে করে কারা পালালো? দেশবাসী ও সেনা কর্মকর্তারা এই রকম অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। দেশবাসী ও সেনা কর্মকর্তাদের এই সব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি।

সেক্টর কমান্ডার লে. জে. মীর শওকত এক টকশোত বললেন, "সেনাবাহিনী আসতে পনের মিনিট, বিদ্রোহ দমন করতে পাঁচ মিনিট..."। লে. জে. শওকত অনেকবার এর আগে সেনা বিদ্রোহ, বিমান বাহিনীর বিদ্রোহ দমন করেছেন। একই ধরণের কথা আরো অনেকেই বলেছেন। তাহলে আধা ঘন্টার সামরিক সমাধানের পরিবর্তে ৩৬ ঘন্টার তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধান হলো কেন? এর আগে জনাবা সাহারা খাতুন ও নানক সাহেব কয়টি বিদ্রোহ দমন করেছেন? ধানমন্ডির এমপি তাপস সাহেব মিডিয়ায় বললেন, 'চমক আছে'! কী চমক? বাষট্টি সেনা কর্মকর্তার লাশ? নাকি সকল হত্যাকারীর পলায়ন! এখানে আরো একটি প্রশ্ন থেকে যায়। প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে বিদ্রোহের সংবাদ জানার পর তিনি সেনাপ্রধানকে প্রশ্ন করে জেনেছেন সেনাবাহিনী আসতে দুই ঘন্টা লাগবে? কোনটা সত্য? আধা ঘন্টা না দুই ঘন্টা? রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নাকি 'গৃহযুদ্ধ' ঠেকিয়েছেন। আসলে কি তাই? প্রধানমন্ত্রীর সাথে যে ১৪ জন মিটিং করেছিল, তারা সবাই কি গ্রেফতার হয়েছে? তাদের তালিকা কোথায়? অনেকে বলেছে সরকার দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। এর তুলনা করা যেতে পারে এভাবে - অপারেশন সাকসেস্ ফুল, কিন্তু রোগী মারা গিয়েছে। বাস্তবতা হলো বিদ্রোহ দমন করা যেত, দমন করা হয়নি। সেনা কর্মকর্তাদের বাঁচানো যেত, বাঁচানো হয়নি।

আমরা বীর সেনা কর্মকর্তা হারালাম, বিডিআরের চেইন অব কমান্ড ধ্বংস হলো, হত্যাকারীরা পালালো - এইসব কারণেই সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ।

৪.২ ঘটনা পরবর্তী সরকারের ভূমিকা

যে মন্ত্রী তথাকথিত বিদ্রোহীদের সাথে দর কষাকষি করেছে সে জাতির সামনে বলেছেন যে, বিডিআর সদর দপ্তরে ঘটে যাওয়া ঘটনার পিছনে একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছিল এবং এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ-কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তিনি সকল তদন্ত শুরু হবার আগেই এবং ঘটনার দুই দিনের মাথায় প্রকাশ্য সমাবেশে এই বক্তব্য দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে তবে কি তিনি আগে থেকেই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জানতেন। তার এই বক্তব্যের সূত্র ধরে এখন সরকার ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের কথা বলে প্রকৃত দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে।

প্রধানমন্ত্রী সংসদসহ বিভিন্ন জায়গায় বিডিআরের ঘটনায় বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন যা অসংলগ্নতায় পরিপূর্ণ এবং বাস্তব ঘটনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এসবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জনগণকে বিভ্রান্ত করা। যেমন তিনি বলেছেন সরকারকে বিব্রত করতে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে অথচ জনগণের কাছে পরিষ্কার যে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দূর্বল করার জন্যই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন যে, সকাল ১১টার মধ্যে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছে। এটা জেনে প্রধানমন্ত্রী কিভাবে দু'দুবার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়, আল-জাজিরাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, বিডিআরের তথাকথিত বিদ্রোহের পিছনে বৈধ কারণ রয়েছে। যেভাবে তথাকথিত বিদ্রোহীরা প্রথম দিন টিভি ক্যামরার সামনে এসে তাদের দাবী দাওয়ার কথা বলে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছিল, একই প্রক্রিয়াই সজীব জয় দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

ঘটনা তদন্তের জন্য এফবিআই ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বাংলাদেশে এসেছে। অর্থাৎ আমেরিকা ও বৃটেন বাংলাদেশের ঘটনার তদন্ত করবে। অথচ এই মার্কিন-বৃটিশরা সারা বিশ্বে মুসলিম নিধনে ব্যস্ত। শুধু তাই নয়, এরা সবাই সরকারকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেছে। উপরন্তু, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে এই বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ভারত ও ভারতের এদেশীয় দোসরদের ভূমিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে।

সরকার মিডিয়াকে দায়িত্বশীল আচরণের কথা বলে এখন সত্য প্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেনা কর্মকর্তাদের বৈঠকের একটি অংশ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছে যাওয়ায় সরকার ঐ ওয়েব সাইটগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ এই

ঘটনার বিশ্লেষণ করে ভারতকে দায়ী করায় ও সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করায় সরকার ৩১ জনকে গ্রেফতার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। জনগণ এমনকি সেনা অফিসারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে কিছুই হয়না আর রাষ্ট্র রক্ষার জন্য রাজপথে নামলে হয় মামলা আর হয়রানি!

সরকার জনগণের দায়িত্ব নেয়ার কথা বলেছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সকলকে দায়িত্বশীল হতে বলছে, অথচ তারা অন্যের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে। আমরা দেখেছি সরকারের স্তাবকেরা বাংলাদেশের মিডিয়ায় ভারতীয় মিডিয়ার বক্তব্য হুবহু তুলে ধরছে, জঙ্গিবাদকে দায়ী করার চেষ্টা করছে, এমনকি সরকারের বয়স মাত্র পঞ্চাশ দিন ইত্যাদি বলে ঘটনার দায়দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তদন্ত কমিটির কোন রিপোর্ট প্রকাশ না হতেই সরকারের মন্ত্রীবর্গ ও মিডিয়া জঙ্গী গোষ্ঠীদেরকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করা শুরু করেছে। আবার একই মন্ত্রী পরবর্তীতে বলছে যে জঙ্গীরা ছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠীও এই ঘটনার সাথে জড়িত। যেখানে ভারতে কিছু ঘটলেই ভারত সরকার পাশ্ববর্তী দেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, সেখানে সরকার পরিকল্পনা করেই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভেদ সৃষ্টি করছে।

বিশ্লেষণের উপসংহারে এসে আমরা বলতে পারি যে এই তথাকথিত বিদ্রোহ একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ, যার সাথে ভারত এবং সরকারের ভিতরে ও বাইরের ভারতীয় দোসর শক্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট। সেনাবাহিনীর মেধাবী কর্মকর্তাদের হত্যাযজ্ঞে লাভবান হবে মুশরিক শত্রু রাষ্ট্র ও তাদের দোসররা। বিভিন্ন দাবির আড়ালে বিডিআর এর চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর কমান্ড থেকে বিডিআরকে বিচ্ছিন্ন করার নীলনকশা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ষড়যন্ত্রকারীরা। এই দাবি বাস্তবায়িত হলে সামগ্রিকভাবে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হুমকির মধ্যে পড়বে। দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় সেনা-বিডিআর এর যৌথ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী অথবা বাংলাদেশ রাইফেল্স এর যে কোন দুর্বলতা অথবা এই দুই প্রতিরক্ষা বাহিনীর পারস্পরিক সম্পর্কের দুর্বলতার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী আমাদের শত্রু রাষ্ট্র ভারত।

এপর্যায়ে এসে এখন আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে এদেশকে ঘিরে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত করা যায়। আমাদের দরকার ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্র যার নিজস্ব শক্তিশালী অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও সমরনীতি থাকবে। খিলাফত রাষ্ট্র দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ভারতসহ সকল শত্রু রাষ্ট্রসমূহের মোকাবেলা করবে। দৃঢ়সংকল্প, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও শক্তিশালী নেতৃত্ব, ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ

জনগণ ও সশস্ত্রবাহিনীই দেশের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমাদের জন্য নেতৃত্বস্থানীয় রাষ্ট্রের মর্যাদা নিশ্চিত করবে।

৫. খিলাফত সরকারের পররাষ্ট্রনীতি

৫.১ বাংলাদেশের শক্তির উৎস

বাংলাদেশ ছোট রাষ্ট্র নয়। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হবার মতো অনেক উপাদান বাংলাদেশে বিদ্যমান। এদেশে রয়েছে:

- ১৫ কোটি মানুষ, যার অধিকাংশ মুসলমান। নেতৃত্ব দুর্বল ও বিভক্ত হলেও বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে এই জাতি ঐক্যবদ্ধ।
- ভৌগোলিক পরিবেশের (বিশেষত: নদীমাতৃক সবুজ সমতল ভূমি) কারণে কোন বহিঃশক্তি কখনো এই ভূমিকে বেশীদিন নিজের অধীনে রাখতে পারেনি। রাশিয়া আক্রমণ করে যেমন হিটলার চরম মাশুল দিয়েছিল, তেমনি এদেশের মাটি দখলে রাখতে যে কোন বিদেশী শক্তির চরম খেসারত দিতে হবে।
- বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এই দেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। অর্থাৎ ভারত ও চীনের মাঝে স্বাধীন মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের গুরুত্ব অনেক। আমরা দেখেছি যে এই কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সেনা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
- অনেকেই ভারতের পেটের ভিতরে বাংলাদেশের অবস্থানকে বাংলাদেশের দুর্বলতা হিসেবে উল্লেখ করেন। কারো ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান কৌশলগত দিক থেকে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অন্যতম শক্তির উৎস।
- বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী শৃংখলাবদ্ধ, দক্ষ ও মেধাসম্পন্ন। আর সশস্ত্রবাহিনীর সাথে এদেশের জনগণের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। প্রতিরক্ষা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি দেশের জন্য অন্যতম পুঁজি।

৫.২ খিলাফত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতি

সমগ্র পৃথিবী ও মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সুস্পষ্টভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষানীতি সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্ এ আলোকপাত করেছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :

(১) "... এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।" [সূরা নিসা : ১৪১]

(২) "তিনিই তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্ম সহকারে, যাতে একে সকল জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরেকরা তা অপছন্দ করে।" [সূরা আছ্-ছফ : ৯]

(৩) "হে মু'মিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু ...।" [সূরা মায়েদা : ৫১]

(৪) "তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে ...।" [সূরা আলি ইমরান : ১১০]

(৫) "ইহুদী ও ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন ...।" [সূরা বাকারা : ১২০]

(৬) "আপনি মানবজাতির মধ্যে ইহুদী ও মুশরেকদেরকে মুসলমানদের অধিক শত্রু হিসেবে পাবেন...।" [সূরা মায়েদা : ৮২]

দূরদর্শী চিন্তা (Vision) ও মূলনীতি:

উপরোক্ত আয়াতসহ অসংখ্য আয়াত ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ থেকে এটা স্পষ্ট যে ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হবে ইসলামের বাণী ও ন্যায়বিচার পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির সামনে তুলে ধরার নীতিকে কেন্দ্র করে। আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র হবার কারণে খিলাফত সরকারের থাকবে একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব ও দূরদর্শী চিন্তা (Vision)। খিলাফত সরকার পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিবে। ইতিহাসে আমরা দেখেছি, আল্লাহ্র জমিনে ইসলামের বিজয়ী পতাকা উড়ানোর রাজনৈতিক উচ্চাশার ফলেই আরবের অনগ্রসর জাহেল সমাজ থেকে উঠে আসা সাহাবারা মদিনার মত ছোট্ট রাষ্ট্রে খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাত্র বিশ বছরের মধ্যে একই সাথে দু'টি পরাশক্তিকে (পারস্য ও রোমান) হারিয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব ইসলামের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বৃটিশদের দু'শ বছর আর রাশিয়া ও আমেরিকার পঞ্চাশ বছরের দুনিয়া শাসনের ইতিহাস থাকলেও খিলাফত রাষ্ট্রের রয়েছে একচ্ছত্রভাবে হাজার বছরের পরাশক্তি থাকার গৌরবময় অতীত।

খিলাফত রাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বকে একীভূত করবে যাতে মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগলিক অবস্থানের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উদীয়মান শক্তি ভারত, চীন ও রাশিয়ার সাথে সফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করতে পারবে। খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই দেশের মানুষ মার্কিন-ভারত-বৃটেনের প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে আসতে পারবে এবং বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই অন্যের আধিপত্য মেনে নেবে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খিলাফত সরকার সকল ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন-ইইউ-ইসরাইলের তাঁবেদারি বন্ধ করবে এবং বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ কঠোরভাবে প্রতিহত করবে। ভারত-মার্কিন-ইইউ-ইসরাইল তথা কোন শত্রু রাষ্ট্রের সাথে যে সমস্ৰ অযৌক্তিক বা জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করবে। ভারত-মার্কিন-ইইউ-ইসরাইল তথা কোন শত্রু রাষ্ট্রের সাথে কোন ধরনের সামরিক চুক্তি কিংবা ট্রানজিট, গ্যাস পাইপলাইন ইত্যাদি চুক্তি করবে না। ভারতের সীমান্ত আগ্রাসন শক্তভাবে মোকাবেলা করবে। তালপট্টি, পানি আগ্রাসনসহ সকল ইস্যুতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

প্রতিরক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতি:

খিলাফতের অর্থনীতি হবে প্রতিরক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতি। উন্নত প্রতিরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা ও তার ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি ও আধুনিকায়নই হবে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। এধরণের অর্থনীতি যে শুধুমাত্র কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টি করবে তা নয় বরং বৈরী পরাশক্তিগুলোর আগ্রাসী পরিকল্পনা থেকেও খিলাফতকে রক্ষা করবে। প্রতিরক্ষা কেন্দ্রিক অর্থনীতির অপরিহার্য করণীয় হলো সমরাস্ত্র তৈরীর কারখানার পাশাপাশি সহায়ক শিল্প হিসেবে স্টীল, লোহা, কয়লা, যানবাহন নির্মাণ, খনিজ উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি শিল্প গড়ে তোলা। খিলাফত সরকার ভারী শিল্পের প্রয়োজনে সহায়ক শিল্প গড়ে তোলার কাজে অনেকাংশেই শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ যোগাবে এবং এক্ষেত্রে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করার সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় নীতি থাকবে। দরকার হলে লোহা, কেমিক্যাল ইত্যাদি শিল্পের জন্য উদ্যোক্তাদেরকে বিনামূল্যে সরকারী জমি বরাদ্দ দিবে; খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও অন্যান্য কেমিক্যাল নিষ্কাশনের জন্য যৌথ বিনিয়োগের নীতি গ্রহণ করবে; যেসব শিল্প রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তায় সরাসরি ভূমিকা রাখছে, তাদের ক্ষেত্রে কর রেয়াত ও ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করবে।

সশস্ত্রবাহিনীর শক্তিশালীকরণ:

দেশের নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় সশস্ত্রবাহিনীকে সার্বিকভাবে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্’র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন...” [সূরা আনফাল : ৬০]

এজন্য–

১. খিলাফত সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে দূরদর্শী চিন্তা তথা ইসলামের বিজয়ী পতাকা উড়ানোর উচ্চাশার (vision) অধিকারী করবে। সশস্ত্রবাহিনীর অবদানকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে তাদের গণহারে শান্তি রক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলা বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে দিয়ে আলু-পটল বিক্রির মত আত্মবিধ্বংসী নীতি আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর শত্রু নিধনের আকাঙ্খাকে দুর্বল করে তুলবে ও তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করবে। প্রকারান্তরে এই সকল ভুল নীতির সুফল ভোগ করবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো।

২. খিলাফত সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন করবে। সরকার সশস্ত্রবাহিনীকে প্রয়োজনীয় বাজেট, সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের মোকাবেলার জন্য যথাযথ প্রস্তুত রাখবে। সশস্ত্রবাহিনীর বাজেট নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। সামগ্রিক বাজেটের অথবা জিডিপির নির্দিষ্ট কোন শতাংশ অথবা অন্য কোন দেশের সাথে কোন প্রকার তুলনা প্রতিরক্ষা বাজেটের ভিত্তি হতে পারে না। আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেট হবে আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে। আর আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩. কোন বিষয়গুলোকে রক্ষা করতে হবে তা নির্ধারণ করা একটি জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। সমগ্র দেশবাসীর জন্য তিনটি বিষয় রক্ষা করা জরুরী। প্রথমত: এদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ মানুষের বিশ্বাস; দ্বিতীয়তঃ দেশের মানুষের জীবন; এবং তৃতীয়তঃ রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পদ। উল্লেখিত জীবন ও সম্পদের মধ্যে রয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, ভৌগোলিক পরিবেশ (নদী, মৎস্য ও বনজ সম্পদ ইত্যাদি), খনিজ সম্পদ (গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদি) ও কৌশলগত সম্পদ (বন্দর, যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ, তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ, শিল্প ইত্যাদি)।

সীমান্তরক্ষী বাহিনী শক্তিশালীকরণ:

রাসূল (সা:) হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে যারা আল্লাহ্‌র জন্য সীমানা পাহারা দেয়, তাদের চোখ কখনো জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না। (তিরমিযী) হাদীসে আরো উল্লেখ আছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে একদিন সীমানা পাহারা দেয়া দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম । (বুখারী-মুসলিম)

খিলাফত সরকার সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে শক্তিশালী করবে। এই বাহিনী জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত বলে বিবেচিত হবে। এই বাহিনী সবসময় সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে থাকবে। এছাড়াও মূল্যবোধ ও সামরিক প্রশিক্ষণ, অস্ত্র-সরঞ্জামাদি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই বাহিনীকে চৌকশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

এখানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বিডিআর পুনর্গঠনের নামে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে যেন কোন দলের রক্ষীবাহিনীতে পরিণত করা না হয়। আর এই বাহিনীতে শত্রু-মিত্রের ধারণা দেয়ার ক্ষেত্রে কোন রকম অস্পষ্টতা সৃষ্টি করা না হয়। অর্থাৎ এই বাহিনীতে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব প্রবেশ করানো না হয়।

প্রযুক্তি:

খিলাফত সরকার প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের ক্ষেত্রে বিদেশী নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। নিরাপত্তার স্বার্থে ও শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power) বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সংগ্রহ ও উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক স্থাপনা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তাদেরকে নিয়ে দেশীয় পারমাণবিক স্থাপনা তৈরী করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষকরা এই মতামত আগেই দিয়েছিলেন। পারমাণবিক শক্তি অর্জনের পদ্ধতি এবং পরবর্তী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মোকাবিলার পথ নিয়েও তারা ইতিপূর্বে বক্তব্য রেখেছেন। মূল কথা হল পারমাণবিক শক্তি, সাবমেরিন, অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ইত্যাদি যে প্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তির ভারসাম্য অর্জন করতে পারবে, দীর্ঘমেয়াদে খিলাফত সরকার তাই করবে।

সিটিজেন'স আর্মিঃ

খিলাফত সরকার বর্তমান সামরিক-বেসামরিক নিবিড় সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নিয়ে সাধারণ জনগণকে দেশের প্রতিরক্ষায় আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত করবে। এই সম্পৃক্ততার ধরণ হবে নিম্নরূপঃ

১. সমগ্র জনগণকে প্রাথমিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং দেশের শত্রু-মিত্র সম্পর্কে জনগণকে পরিষ্কার ধারণা দেয়া।
২. ১৫ বছরের উর্ধ্বে দেশের প্রত্যেক তরুণকে বাধ্যতামূলক মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া। দেশে প্রচলিত স্কুল পর্যায়ের সর্বশেষ পরীক্ষার পরে প্রতি স্কুলে দুই মাসব্যাপী এই প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা যেতে পারে।
৩. যারা স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে যারা এখনো চল্লিশ বছর অতিক্রম করেননি, তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা।
উকবা ইব্‌ন আমের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে মিম্বারের উপর আসীন অবস্থায় আমি বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী *'এবং তোমরা তাদের মোকাবেলায় শক্তি সঞ্চয় করে রাখো।'* **"জেনে রাখো, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী, জেনে রাখো, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী, জেনে রাখো, শক্তি হচ্ছে তীরন্দাযী।"** (মুসলিম শরীফ) এখানে খিলাফত রাষ্ট্রের প্রতিটি সক্ষম নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

কূটনৈতিক তৎপরতাঃ

সামরিক শক্তি একটি দেশের নিজস্ব পছন্দ বা সিদ্ধান্ত। কিন্তু কূটনীতির বিষয়টি সেরকম নয়। খিলাফত সরকার বহিঃর্বিশ্বে বন্ধু সন্ধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তবে চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় "Friendship to all, malice to none" জাতীয় হাস্যকর পররাষ্ট্রনীতি একান্তই পরিত্যাজ্য। একমাত্র পাগল ও নাবালকের কোন শত্রু থাকতে পারে না। এই নীতি একটি দেশের দুর্বলতার পরিচয় বহন করে মাত্র। খিলাফত সরকার আমাদের কূটনীতিবিদদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দরকষাকষির জন্য (Negotiation) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

এক্ষেত্রে হুদায়বিয়ার সন্ধির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কুরাইশদের সাথে ব্যাপক দরকষাকষির পর স্বাক্ষরিত এই চুক্তির মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করেছিলেন- চুক্তিটির ফলে সমগ্র আরব বিশ্বে এবং বিশেষ করে কুরাইশদের মধ্যে ইসলামের পক্ষে জনমত তৈরী হয়েছিল। এছাড়াও এই চুক্তির ফলে খিলাফত রাষ্ট্র কর্তৃক খাইবার বিজয়,

এমনকি মক্কা বিজয়ের পথও সুগম হয়েছিলো। কুরাইশদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আরব উপদ্বীপে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছিলো। শুধু তাই নয়, রাসূল (সাঃ) এই সময়ে আরবের বাইরেও ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

৬. আমাদের করণীয়

জাতির এই ভয়াবহ সংকটময় মুহূর্তে দেশবাসীর প্রতি হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ আহ্বান জানাচ্ছে-

১. দেশবাসীকে সর্বাবস্থায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে; আর ইসলামই এদেশে মানুষের ঐক্যবদ্ধ থাকার একমাত্র ভিত্তি।
২. সেনাবাহিনী-বিডিআরকে বিভক্ত ও দুর্বল করে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে হবে।
৩. সেনাবাহিনী, বিডিআরসহ সার্বিকভাবে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।
৪. খিলাফত প্রতিষ্ঠায় দেশবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। একমাত্র খিলাফত সরকারই জাতীয় প্রতিরক্ষার সাথে সংশিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান এবং দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারত-মার্কিন-বৃটেনসহ সকল শত্রু রাষ্ট্রসমূহের মোকাবেলা করতে সক্ষম।
৫. সমাজের সচেতন অংশকে সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের মানুষের সামনে রাষ্ট্রের শত্রু-মিত্রের ধারণা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে।
৬. নিষ্ক্রিয়তা ও রহস্যজনক ভূমিকার জন্য সরকারকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করতে হবে।
৭. এই তথাকথিত বিদ্রোহের সাথে জড়িত ষড়যন্ত্রকারী ও হত্যাকারীদের বিচারের সম্মুখীন করার ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে।
৮. দেশী-বিদেশী তদন্তের নামে সরকার যেন এই ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে না পারে সেদিকে সকলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।
৯. হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তি দিতে হবে।

দ্বিতীয় ড্রাফ্‌ট
২৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩০
২৩ মার্চ, ২০০৯
ঢাকা